গ্রামসেবকের চিঠি

৩য় বর্ষ : জানুয়ারি ১৯৬০ (১৮৮১ শকাব্দ) : ৪র্থ সংখ্যা

(উপরে) কয়লপাড়ায় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ব্লক অফিসের জন্য জমির দানপত্র গ্রহণ করছেন উন্নয়ন কমিশনার।

(পাশে) কতেপুর উচ্চবালে শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র ও বয়ন শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রের ফিতে কাটছেন উন্নয়ন কমিশনার।

গ্রামসেবকের চিঠি

৩য় বর্ষ] জানুয়ারি ১৯৬০ (১৮৮১ শকাব্দ) ৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে একটি বিশেষজ্ঞদল এদেশে এসেছিলেন সমাজ-উন্নয়ন কাজটি দেখতে ও তার ভাল-মন্দ বিচার করতে। এই দলে ছিলেন কানাডার এস জে কোল্ডওয়েল, ফ্রান্সের প্রফেসর ডুমো ও ইংলণ্ডের মার্গারেট রীড।

দিল্লীতে যে Evaluation Organisation রয়েছে, তাঁরা প্রতি বছরই কাজটি বিশেষভাবে দেখে তাঁদের মতামত দিচ্ছেন। কাজের ভুল-ত্রুটি সেই-মত শুধরে নেওয়ারও চেষ্টা হচ্ছে।

কিন্তু খুব কাছ থেকে কোন জিনিস সব সময় দেখলে, অনেক সময়েই অনেক দোষ-ত্রুটি চোখে পড়ে না, অথচ বাইরের লোকের চোখে তা সহজেই পড়ে। তাই নিজেদের কাজের বিচারের ভার কেবলমাত্র নিজেদের ওপর না রেখে, ভারত-সরকার বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কাজটির মূল্যবিচার করতে চাইলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ সেইমত এই ছোট দলটিকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন।

এঁরা তিন মাস এদেশে থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেন। মোটামুটি কয়েকটি বিষয় তাঁরা দেখেন। প্রথমটি হচ্ছে সমাজ-উন্নয়ন কাজের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়টি সাধারণ উন্নয়নের ওপর এই কার্যসূচির প্রভাব। তৃতীয়ত গ্রামবাসীর দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন। চতুর্থত দেশের আর্থনীতিক উন্নতিতে এই কার্যসূচিটির দান এবং কাজের ফলাফল আজ পর্যন্ত কি হয়েছে। এই কয়টি জিনিস পর্যালোচনা ক'রে দেখে তাঁরা তাঁদের মন্তব্য দেন। তাঁদের মন্তব্যে কতকগুলি কাজ সম্বন্ধে তাঁরা যেমন প্রশংসা করেছেন, কতকগুলি বিষয়ে তাঁরা সমালোচনাও করেছেন। শুধু সমালোচনা ক'রেই চুপ থাকেন নি, নতুন ধারণাও দিয়েছেন।

তাঁদের মতে ভারতে গ্রামজীবনে পরিবর্তন আনার যে চেষ্টা হচ্ছে, সে কাজটি খুবই শক্ত। কারণ প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সেখানে এমন সুদৃঢ় যে, কোন পরিবর্তন সহজে আনা কঠিন। আইন দিয়ে করাতে গেলে তার ফল ভাল হয় না। ভারত-সরকার যে নীতি নিয়েছেন কাজের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা, তার তাঁরা প্রশংসা করেছেন। সমাজ-উন্নয়ন কার্যসূচির মধ্যে দিয়ে প্রাচীন স্বৈররাজ্য থেকে গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা চলেছে, তারও তাঁরা প্রশংসা করেছেন।

এই কার্যসূচিটিকে আলাদাভাবে না ক'রে দেশের স্থায়ী সাধারণ শাসনসংস্থের সঙ্গে যে সংযুক্ত করা হয়েছে তাঁরা এর বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। এতে অর্থ এবং কর্মী দুদিক থেকেই সুবিধা পাওয়া যায় কাজটি করার জন্য।

বি ডি ও-দের প্রতি বছরে খরচের জন্য নির্দিষ্ট টাকা দেওয়া হয়। তার সমালোচনা ক'রে তাঁরা বলেছেন যে, টাকাটা এইভাবে দেওয়ার জন্য কাজটি কতটা হয়েছে তার বিচার করা হয়, কত টাকা খরচ হয়েছে তা দেখে। কাজেই টাকা খরচের ওপরই কর্মীদের নজর থাকে, কাজের উদ্দেশ্যের সফলতার চেয়ে।

সমাজ-উন্নয়ন কাজ প্রতি বছরে নতুন নতুন এলাকা নিয়ে যেভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তার তাঁরা বিশেষ নিন্দা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ব্লকের সংখ্যা না বাড়িয়ে যেসব ব্লক হয়েছে তার কাজটি যাতে ভালভাবে দানা বেঁধে উঠে তার দিকেই নজর দেওয়া উচিত। কাজটি এভাবে ছড়িয়ে পড়তে দিলে ভবিষ্যতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হবে, সেকথাও তাঁরা বলেছেন।

কার্যসূচির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, কৃষিই এখনকার বড় সমস্যা। কিন্তু কৃষি-উন্নতির চেয়ে গ্রামের রাস্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই খরচ বেশি করা হয়েছে। কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থায় রাস্তা তৈরি বা পয়ঃপ্রণালী তৈরির জন্য টাকা খরচ না করে, যাতে দেশের উৎপাদন বাড়ে, এমন কাজের জন্যই বেশি টাকা

খরচ করা উচিত। যেখানে সেচের সুবিধা আছে সেখানে বেশি কর্মী দিয়েও নিবিড়ভাবে চাষ করার চেষ্টা করা উচিত।

গ্রামের সাধারণ লোককে দিয়ে আরও বেশি এ কাজ করানো দরকার। নিবিড় চাষের কাজ, বনীকরণ, জমি সংরক্ষণ ও ছোট সেচ পরিকল্পনা ইত্যাদি কাজগুলি গ্রামবাসীদের দিয়ে করানো উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। গ্রামের যুবকদের সম্ববদ্ধ ক'রে এ কাজের মধ্যে তাদের বেশি ক'রে টেনে আনা দরকার।

সমবায় সমিতি করার যে চেষ্টা হচ্ছে তার প্রশংসা করেছেন তাঁরা। তবে সার্ভিস কো-অপারেটিভ করার ওপর বেশি জোর দিতে বলেছেন। সমবায় পরিকল্পনা কৃতকার্য ক'রে তুলতে গেলে সমবায় সভ্যদের বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত বলে তাঁরা মনে করেন। এ ছাড়া আরও যা দরকার তা হচ্ছে ব্লক থেকে আরও উৎসাহ এবং যত্ন নেওয়া এ কাজ সম্বন্ধে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তাঁরা প্রশংসা করেছেন। তবে পঞ্চায়েত যাতে সত্যিই গ্রামে কার্যকরী হয়ে উঠে তার জন্য শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধাও পঞ্চায়েতকে দেওয়া দরকার।

গ্রামশিল্প সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন যে, শিল্পীদের কতকগুলি শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেই হবে না গ্রামশিল্পের উন্নতির জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত এবং এমন-সব শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত যেগুলি দু'-এক বছরের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির সুবিধা পেতে ...। গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার দিকে নজর না দিয়ে দেশের বৃহৎ শিল্পের উন্নতির জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সংযোগ ক'রে গ্রামের শিল্প গ'ড়ে তোলার দিকে নজর দেওয়া উচিত।

এখানে কর্মীদের শিক্ষা দেওয়ার যে ব্যবস্থা আছে তার তাঁরা বিশেষ প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, যেসব দেশে সমাজ-উন্নয়ন কাজ সুরু হয়েছে তাঁরা ভারতবর্ষের শিক্ষাসূচি থেকে অনেক সুবিধা পেতে পারেন।

গ্রামবাসীর ওপর এই পরিকল্পনার প্রভাব অনেকটা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন। এখন বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে খরচ অনেক কম ক'রে ব্যবসা বা চাষের কাজে সে টাকা খরচ করছেন। আগের চেয়ে বেশি তাঁরা উন্নত বীজ ও সারের ব্যবহার করছেন। বেশি ক'রে সেচের দিকে নজর দিয়েছেন। বালাবিবাহ ক'মে গেছে এবং অনেক বেশি মেয়ে এখন স্কুলে যাচ্ছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সমাজ-উন্নয়ন কার্যসূচি গ্রামের জীবনে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে। উন্নতিও খানিকটা হয়েছে। কাজে ভুল-ত্রুটি অনেক হয়েছে দেখা যাচ্ছে। তবে কাজ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি ঘটেই থাকে। কাজ করলেই তবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষ শেখে এভাবেই। নানা রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

অন্দর মহল

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র চট্টরাজ

গুপ্তকরা

(শেষ অংশ)

চতুর্থ দৃশ্য

[স্থান সমিতির অফিস-কক্ষ। গোপা টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমিতির মেয়েরা গোপাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া।]

গোপা। আজ তোমাদের কেন ডেকেছি, বুঝতে পেরেছ?

শোভা। হ্যাঁ, দিদিমণি।

গোপা। আজ তোমাদের সামনে বড় দায়িত্ব, এ দায়িত্ব আজ যদি তোমরা না নাও, তা হ'লে এ গ্রাম ধ্বংস হয়ে যাবে। কলেরা যে রকম মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে তাতে রোগীর সেবা থেকে সব-কিছু নিজেদের করতে হবে। এ সমিতির প্রত্যেকটি সভ্যাকে জীবন-মরণ পণ ক'রে এ কাজে নামতে হবে।

শোভা। আমাদের কি কি করতে বলেন দিদিমণি?

গোপা। কি করতে বলি? সব-কিছুই করতে বলি। প্রত্যেকটি বাড়িতে কলেরার ইনজেকসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা, যে যে বাড়িতে অসুখ হয়েছে তাদের বাড়ি গিয়ে রোগীর সেবার ভার নিজেদের হাতে নেওয়া—এক কথায়, যাদের রোগ হয়েছে তাদের বাঁচানো এবং আর কারও যাতে না হ'তে পারে তার জন্য হুঁশিয়ারী বন্দোবস্ত করাই হ'ল আজ এই সমিতির প্রধান এবং প্রথম কাজ।

শোভা। তা হ'লে সমিতির সব কাজ এখন বন্ধ থাকবে?

গোপা। একথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ শোভা? তোমার সাধারণ জ্ঞান একেবারেই নেই দেখছি।

শোভা। কেন দিদিমণি?

গোপা। গ্রামের লোক যদি ম'রে ভূত হয়ে যায় তো কাকে নিয়ে সমিতি করবে? সমিতি গ্রামের মঙ্গলের জন্য। কাজেই এখন সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ রেখে মহামারীর প্রকোপ নিবারণ করা আগে দরকার, লোক বাঁচলে তবে তো সমিতি।

বেলা। সেকথা কি আর বলতে হয়। শোভার কিছু জ্ঞানগম্যি নেই। এখন কার ওপর কি ভার দিচ্ছেন বলুন?

গোপা। আমি কারও ওপর কোন নির্দিষ্ট কাজের ভার দেব না, তোমরা নিজেরাই নিজেদের কাজ ভাগ ক'রে নেবে।

বেলা। কি কি কাজ প্রথমে করতে হবে?

গোপা। সেইটাই আমি প্রথমে ব'লে দেব। প্রথম কাজই হচ্ছে গ্রামের প্রতিটি মেয়েকে ইনজেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

বেলা। তারপর?

গোপা। যেসমস্ত বাড়িতে রোগ হয়েছে সেইসব বাড়ি গিয়ে রোগীর সেবা করতে হবে।

বেলা। রোগীর সেবা বাড়ির লোকেই তো করছে, আমরা গিয়ে কি করব?

গোপা। বাড়ির লোকে সেবা করছে বলেই তো এত মরছে। রোগীর মাথার কাছে ব'সে পাখা করলেই তো আর সেবা করা হয় না।

বেলা। কিন্তু কলেরা রোগীর পাশে ব'সে তার সেবা করা—

গোপা। কেন, ভয় হচ্ছে? তা হ'লে তুমি এস না, তোমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

বেলা। কেন দিদিমণি?

গোপা। এখন ভয় করলে তো চলবে না। মনে সাহস থাকা চাই। হ্যাঁ, একটা কথা আজ তোমাদের বলতে চাই।

বেলা। কি কথা দিদিমণি?

গোপা। তোমাদের কাউকেই জোর ক'রে কিছু করানো হচ্ছে না, বা হবে না।

বেলা। সে আমরা জানি দিদিমণি, আজ ও-কথা বলছেন কেন?

গোপা। দেখ, যদি কারও মনে 'কিন্তু' থাকে স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পার, কেউ অসন্তুষ্ট হবে না; কিন্তু এই সমিতির মূল নীতিই হ'ল সমাজের সেবা

ও কল্যাণ। আজ সেবার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি, তাই যারা সমিতির আদর্শ মেনে চলতে চাও তারাই থাক। যাদের মন চাইবে না তারা এস না। তাতে যদি একটি মেয়েও থাকে তাতেই কাজ হবে। আসল কথা হ'ল আজ চাই প্রকৃত কর্মী এবং এর ওপর নির্ভর করছে আমাদের সমিতির ভবিষ্যৎ। আর-একটা কথাও জেনে রাখ।

শোভা। কি কথা দিদিমণি?

সোপা। বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষের সময় দেশের দরদী বন্ধু কে বাচাই করা যায়, আর সেবা করাকে যদি কাজ করা ভাব তো ভুল হবে।

শোভা। কেন দিদিমণি?

সোপা। সেবা তো কাজ নয়।

শোভা। কাজ নয়তো কি?

সোপা। সেবা হচ্ছে ব্রত। ব্রত করার সময় যেমন কেউ নিজের সুখ-সুবিধা দেখে না বরং যত কষ্ট-সাধ্য ব্রত হয়, ভাবে পুণ্য ততই বেশি হবে। সেবা করার সময়ও ঠিক এই কথাই মনে রাখতে হবে যে, সেবার ব্রত গ্রহণ ক'রে যত দুঃখ-কষ্ট পাবে, সমাজ-সেবা ব্রতের পুণ্য তত বেশি হবে। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও স্বার্থ দেখলে সেবা করা চলে না। কাজেই যদি সমিতির কাজ করতে চাও, তা হ'লে ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না, সাহস ক'রে বিপদের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এর জন্য চাই মনোবল এবং কর্মনিষ্ঠা। কি তোমরা সব পারবে তো?

(মিতার প্রবেশ)

এস মিতা, বোস, এতে লজ্জার বা সঙ্কোচের কোন কারণ নাই।

মিতা। কিসের সঙ্কোচ দিদিমণি?

সোপা। আজ সমিতির কাজই হচ্ছে সেবা করা। তাই বলছি, যদি কারও সে সাহস না থাকে, যদি কেউ রাজী না হও—

মিতা। না দিদিমণি, আমরা সবাই রাজী আছি। দেশের ও দশের কাজে নামতে ভয় আমাদের কোন দিন হয় নি এবং ভগবান করুন যেন কোন দিন না হয়। এখন কাকে কি করতে হবে বুঝিয়ে বলুন তো।

সোপা। না, সে ভারও আমি তোমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। কে কোন্ কাজ করবে তোমরা নিজেরাই ঠিক ক'রে নাও।

মিতা। ভাল করেছেন। আচ্ছা বেলা তুই কি করবি?

বেলা। আমি ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের ইনকুলেশান দেওয়াব। তুমি কি করবে মনে করেছ?

মিতা। তা হ'লে আমি রোগীর সেবা করতে বেরুব।

সোপা। কে? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন।

(রানুর প্রবেশ)

মিতা। আরে রানুদিদি যে? তা তুমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলে কেন?

রানু। তোমাদের কথা শুনছিলাম।

মিতা। চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলে কেন, ভেতরে না এসে?

রানু। চোরের মতই এসেছিলাম, ভেতরে ঢোকবার জন্য আসি নি।

সোপা। কি রকম?

রানু। আপনি ক্ষমা করবেন, সব কথা খুলেই বলি।

সোপা। আপনি আমার কি দোষ করেছেন যে আমি আপনাকে ক্ষমা করব? ওসব কথা বলবেন না, কি বলবেন বলছিলেন বলুন।

রানু। আমাদের পাড়ার বরাবর আপনাদের নিন্দাই শুনেছি, তাই আজ গোপনে আপনাদের কাজকর্ম দেখতে এসেছিলাম। আজ আমার ভুল ভেঙেছে।

মিতা। ওঃ, এত ব্যাপার।

রানু। হাঁ। তোমাদের মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করব না, কাজ সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সোপা। নিশ্চয় পারেন। আপনার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তো বলুন—একশো' বার বলবেন।

রানু। আপনারা যে গাঁয়ের ভাল করবার জন্য কাজে নেমেছেন এতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তবে আপনার কর্মীদের গোটকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করব।

সোপা। করুন।

রানু। (মিতার দিকে) মনে কর কোন লোকের বাড়ি গেলে টিকা দেওয়ার জন্যে, কিংবা এই-জাতীয় কাজ নিয়ে। যদি সেখানে বাধা পাও কাজ করতে পারবে?

মিতা। পারব কিনা জানি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আর পারব না-ই বা কেন?

রানু। যদি গালাগালি দেয়?

মিতা। দেয় তো দেবে, শুধু দু'টো মুখের কথা বইতো নয়। কাজ করতে গেলে কে কি বলছে শুনলে কোন কাজই করা হয় না। সব লোকেরই তো আর একমত নয়। ভাল-মন্দ দু'রকম মানুষই আছে। যারা মন্দ তারা ভাল কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করবে। তাদের কথা শুনে যদি সরে দাঁড়াই, তা হ'লে কোন কাজই তো করা হবে না। আর এই-জাতীয় লোককে ভাল করাই তো হ'ল কাজ।

রানু। কি ক'রে ভাল করবে?

মিতা। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, অনুনয়-বিনয় ক'রে।

রানু। যদি তোমার কথা না শোনে?

মিতা। তা হ'লে আমি আমার কর্তব্য ক'রে যাব, তাতে গাল দেয় দেবে। কে কি বলছে শুনে ভয়ে পিছিয়ে আসবার মেয়ে আমি নই। দিদিমণি, আপনি কি করবেন?

সোপা। আমি কি করব? আমি তোমাদের দেখা-শোনার ভার নিচ্ছি। যেসমস্ত কর্মী পাঠাচ্ছি তাদের দেখাও তো আমার কর্তব্য। তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না, এবং হ'লে তার ব্যবস্থা করাও দরকার। সেই ভারটা আমি নিচ্ছি।

মিতা। খুব ভাল কথা।

সোপা। আর দেরি ক'রে লাভ নেই। এখুনি বেরুচ্ছ তো?

সকলে। হ্যাঁ দিদিমণি।

সোপা। ভগবানের নাম নিয়ে বেড়িয়ে পড়।

রানু। আমি যদি আপনাদের সঙ্গে যাই কোন আপত্তি আছে কি?

সোপা। কি যে বলেন আপনি, আপত্তি থাকবে কেন? আপনাদের সাহায্যই তো আমরা চাই।

রানু। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই, যে ভুল এতদিন করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত যদি কিছু হয়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান—মহেশের বাটী। মহেশ ও মিতা মুখোমুখী বসিয়া]

মহেশ। না, না, না—এ হ'তে পারে না। এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ তুই কি করলি মিতা?

মিতা। কেন বাবা, আমি কি অন্যায় করেছি?

মহেশ। অন্যায় নয়? একে বাগদীপাড়া, তাতে আবার কলেরা রোগী। তুই গেলি কিনা সেখানে সেবা করতে? এ তুই কি করলি?

মিতা। কেন বাবা? তোমার মুখে কি আজ এ-কথা শোভা পায়? কে বাগদী, কে বামুন—এ বিচারের যুগ কি আর আছে?

মহেশ। তা হোক। ওসব ব্যাপারে তোর না যাওয়াই ভাল ছিল, বুঝলি? শুধু শুধু কেন ঝঞ্ঝাট টেনে আনলি মা? ঘরের মেয়ে ঘরে আছিস, সমিতিতে আছিস, বেশ করছিস। তা বাইরে গিয়ে ওসব করা কেন?

মিতা। সে কি ক'রে হয় বাবা? তুমি তো জান, সমাজসেবা আমাদের সমিতির প্রধান কাজ। আজ গ্রামের বড় দুর্দিন। কলেরার বাগদীপাড়া উজাড় হ'তে বসেছিল। সেবা করা দূরে থাক ওদিকে কেউ উঁকিও মারে নি। এ অবস্থায় পাড়াটাকে তো উজাড় হ'তে দেওয়া যায় না?

মহেশ। কিন্তু তাই ব'লে বড়-ছোট মানবি না, এই-বা কেমন কথা হ'ল?

মিতা। কেন বাবা, আমি কি কোনদিন তোমার অসম্মান করেছি? তুমি আমার বাবা-মা সব। ছোট-বেলা থেকেই মায়ের যত্ন ও ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তুমিই আমাদের দুই ভাই-বোনকে মানুষ করেছ। আজ তুমি একথা কেন বলছো?

মহেশ। একটা কথা শুনে অন্তরে বড় আঘাত পেলাম কিনা তাই বলতে হচ্ছে।

মিতা। আমার কথা শুনে অন্তরে আঘাত পেলে তুমি? কি এমন কথা বাবা? আমি যে কল্পনাও করতে পারছি না। কার কাছে কি শুনেছ খুলে বল, নইলে আমি যে স্বস্তি পাচ্ছি না।

মহেশ। বলব ব'লেই তো ডাকলাম। বস, অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

মিতা। না, না। তুমি আগে বল বাবা, তার পর অন্য কথা। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে, আমি তোমার অন্তরে আঘাত দিয়েছি—এ যে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না। শিগ্‌গির বল বাবা।

মহেশ। ও-পাড়ার নীরোদ বাঁড়ুজ্জেকে কি বলেছিস?

মিতা। ওঃ, এই কথা। আমি তো ভেবে আকুল, তোমার অন্তরে আঘাত দিয়েছি আমি! এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলাম।

মহেশ। কি বুঝলি?

মিতা। তিনি যে তোমার কাছে আসবেন তা আমি জানতাম। তা তাঁকে আমরা এমন কোন কথা বলি নি, যাতে তাঁর অন্তরে আঘাত লাগে।

মহেশ। কি বলেছিলি?

মিতা। আমরা কলেরার ইনকুলেশান দিতে গিয়েছিলাম। উনি বলে বেড়াচ্ছিলেন যে ওতে কিছু হয় না। লোককে ইনকুলেশান নিতে বারণ করছিলেন।

মহেশ। তারপর?

মিতা। আমি ও দিদিমণি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, যাতে ওসব কথা না বলেন।

মহেশ। কি বললে সে?

মিতা। কিন্তু আমাদের অনুরোধের প্রতিদানে তিনি দিদিমণিকে যে রকম গালিগালাজ ও অপমান করেছেন তাতে গাঁয়ের মান-সম্মান পর্যন্ত মাথায় উঠেছে, তা জান? দাদার কাছে সব শুনো।

মহেশ। কই, আমি তো এসব শুনি নি? তা কি দরকার ছিল তোর ওসবের মধ্যে যাওয়ার?

মিতা। সবাই যদি তোমার মত ওই কথা বলে তো কারও কোন কাজ করা হয় না, নীরদবাবু বুঝি তোমার কাছে এসেছিল?

মহেশ। না আসে নি। লোকমুখে শুনেছিলাম।

মিতা। আসতে পারে তোমার কাছে।

মহেশ। এসে পাঁচ কথা শুনিয়ে যাবে সেটা কি ভাল হবে?

মিতা। তুমি শুধু আমার বাড়ি আসার কথাই ভাবছ। একজন বাইরের মহিলা যে এই গ্রামের জন্য আত্মবিসর্জন দিয়েছে বললেও চলে, তাকে অন্তর ভাষায় অপমান করেছে সে কথাটা তোমার গায়েই লাগছে না। তুমি শুধু বাঁড়ুজ্জের কথাটাই ভাবছ, একবার দিদিমণির কথাটাও ভাব।

মহেশ। তা অন্য কোন মেয়েও তো যেতে পারত? তোর যাওয়ার কি দরকার ছিল?

মিতা। এ তোমার পক্ষপাতিত্ব বাবা। বাঁড়ুজ্জে-মুখুজ্জে ভেবে তো আর কাজ করা যায় না। সমিতি থেকে যাকে যে কাজের ভার দেবে তাকে তাই করতে হবে।

মহেশ। শুধু সমিতি আর তার কর্তব্য। বাবার কথা রাখাটা কি কর্তব্য নয়?

মিতা। বাবা, তুমি ও-কথা বললে আমার কোথাও যাওয়া চলে না। আমি কি তোমার আদেশ অমান্য করে যেতে পারি? তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছ 'রোগীর সেবা পরম ধর্ম' আজ যদি তুমি নিজেই বাধা দাও, তা হলে আমার বলার কিছুই নেই। আমি এক পা-ও যেতে পারব না। কারণ, সমিতির কাজও যেমন আদর্শ, তোমার আদেশ অমান্য করাও সেই রকম অধঃপতন। গুরুজনদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করাও জীবনের চরম আদর্শ। সে আদর্শ কি ক্ষুণ্ণ করতে পারি? সে যে চরম অপরাধ। তোমার কাছে এ আমার আবদার, এ আমার দাবি—এ আমার উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। এ তোমাকে অপমান করা নয়। তুমি ভুল বুঝো না বাবা। তুমি তো এমন ছিলে না? তোমার মুখ থেকে আজ এসব কথা কেন বেরুচ্ছে?

মহেশ। কি জানি মা, আজ সব গুলিয়ে যাচ্ছে। বুঝছি সবই, আবার কিছুই বুঝছি না।

মিতা। তোমার মনের কথা আমি খুব ভাল করে বুঝেছি বাবা।

মহেশ। অদৃষ্টে যে কি আছে মা তা তো জানি না, তাই বড় ভয় হয়। কি জানিস? তোর মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তোদের দু ভাই-বোনকে মানুষ করেছি। তোরা যা চেয়েছিস আমি তাই দিয়েছি, যা বলেছিস আমি তাই করেছি। কখনও তোদের বিমুখ করি নি। সব সময় তোদের আবদার মেনে নিয়েছি। এটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি, বুঝতে পারছি না।

(নীরোদের প্রবেশ)

নীরোদ। খুব ভাল করেছ খুড়ো, এমন ভাল আর কেউ করে না।

মহেশ। এস নীরোদ, এস—বোস।

নীরোদ। বসি (বসিয়া) কিন্তু খুড়ো এ কি হচ্ছে? তোমরা দেখছি গাঁয়ে আর বাস করতে দেবে না।

মহেশ। কেন?

নীরোদ। আবার জিজ্ঞাসা করছো 'কেন'? তুমি গাঁয়ের একটা মুরুব্বি লোক, তুমি যদি এইসবের প্রশ্রয় দাও, তা হ'লে আর কাকে দোষ দেব?

মহেশ। প্রশ্রয়ের কথা কি বলছ?

নীরোদ। মেয়েদের এইসব বেল্লিকপনায়। গাঁয়ের মেয়েদের যে আর বিয়ে হবে না খুড়ো। তাদের কি ঘরে জিইয়ে রাখবে ঠিক করেছ?

মহেশ। বিয়ে হবে না কেন?

নীরোদ। হবে না কেন জিজ্ঞাসা করছ? দিন নাই, রাত নাই বাগদীপাড়ায় আর বাউরীপাড়ায় টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে অত বড় বড় ঢিঙি ঢিঙি মেয়ে সব। লোকে খুব ভাল বলছে?

মিতা। কে কি বলছে না বলছে, আমি খুব ভাল ক'রে জানি। কেউ কিছু বলে না বাবা।

নীরোদ। তুই থাম তো। তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। খুড়ো, দেখলে তোমার মেয়ের সভ্যতা?

মহেশ। মেয়ে আমার অসভ্যতা কি করলে তাই তো বুঝছি না।

নীরোদ। তা আর বুঝবে কেমন ক'রে? এখন যে চোখ থাকতেও অন্ধ।

মহেশ। একটু সাবধানে কথাবার্তা বল নীরোদ, রাগের মাথায় মাত্রা ছাড়িও না। নেহাত আমার বাড়ির ভেতর আছ—

নীরোদ। নইলে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিতে—এই তো?

মহেশ। ঠিক তাই। আমার এবং আমার মেয়ের নিন্দা শুনছি, শুধু তুমি আমার বাড়ির ভিতর বলে।

নীরোদ। ওঃ, এতখানি!

মহেশ। হ্যাঁ, এতখানি। অন্যায়কে আমি কোনদিনই প্রশ্রয় দিই না বা দেবও না।

নীরোদ। তা আমি খুব ভাল ক'রে দেখতে পাচ্ছি। তাই মেয়ে-ছেলে সব একসঙ্গে মিলে বাগদী বাউরী সাঁওতাল পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন-কিছু মানামানি নাই, লজ্জা সরমের বালাই তো নেই-ই। তাই বলতে এলে তুমি ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিতে চাও। তুমি অন্যায়ের প্রশ্রয় দাও না? বাঃ, চমৎকার খুড়ো। তোমার কাছে আজ অনেক-কিছু শিখলাম। যত সব বেহায়া জুটে—

মহেশ। বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

নীরোদ। হ্যাঁ, বেরিয়েই যাচ্ছি। তবে জেনে রেখ খুড়ো, আমার নাম যদি নীরোদ বাঁড়ুজ্যে হয়, তবে এই সমিতি আমি ভাঙব-ই।

মহেশ। তবে এও জেনে যাও যে, আমার নাম যদি মহেশ ঘোষ হয়, তবে সমিতির কাচকলাও তুমি করতে পারবে না।

নীরোদ। দেখাই যাবে।

(প্রস্থান)

মহেশ। যত সব অশিক্ষিত অপগণ্ড।

মিতা। ওদের কথায় কি রাগতে আছে বাবা? প্রত্যেক গ্রামে ও রকম লোক কিছু থাকবেই, ওদের ওপর রাগ করলে চলে না। ওদের ভাল করাই যে হ'ল আসল কাজ।

মহেশ। কি যে বলিস, ওদের ভাল করবি তোরা?

মিতা। হ্যাঁ, বাবা, ওদের ভাল করতেই হবে। ওদের ভুল আগে ভাঙতে হবে, তা না হ'লে আর পাঁচজনও তো ওদের কথা শুনে ভুল পথে চলবে।

মহেশ। না, না, না—ওদের শায়েস্তা করা আগে দরকার। শুনলি না? বলে সমিতি ভেঙে তবে ছাড়বে।

মিতা। ওরকম অনেকে ব'লে থাকে। রাগের মাথায় যা বলে তাই কি আর করে? রাগ কমে গেলে আপনি বুঝতে পারবে।

মহেশ। ওদের চোখ কখনও ফুটবে না রে।

মিতা। ফুটিয়ে দিতে হবে বাবা। আমরা সবাই একদিন ওঁর বাড়ি গিয়ে ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করব। বোঝ পারি কিনা।

মহেশ। তবেই হয়েছে।

মিতা। না হবার কোন কারণ নেই। ওরকম অনেক লোকের ভুল ভাঙিয়েছি, এখন দু'-একজন বাদে গাঁয়ের সবাই বুঝেছে যে, গ্রামে এই রকম মহিলা সমিতির দরকার।

মহেশ। কিন্তু সব সময় নিজেকে কড়া ও বিপদের মাঝে ফেলছিস যে মা?

মিতা। তা হোক। ওতে কিছু হবে না।

অরুণেশ। না হ'লেই যে বাঁচি। ভগবান, দেখো যেন ওদের কিছু না হয়। ওরাই আমার সম্বল। আমি সব ছাড়তে পারি যদি ওরা আমার পাশে থাকে।

মিতা। বাবা চল, সন্ধ্যা হয়ে এল।

অরুণেশ। যাই মা।

(প্রস্থান)

স্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান—প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ। প্রদর্শনী সমিতির সভাপতি এবং গোপা পাশাপাশি চেয়ারে বসিয়া—সম্মুখে টেবিল, তাহা টেবিল-ক্লথ দিয়ে ঢাকা। তার দুই প্রান্তে ফুলদানি নানা প্রকার ফুলে ভর্তি। সামনে খাতা এবং কর্মসূচি। চারিদিকে সূচের বিভিন্ন প্রকারের কাজ (ব্লাউজ, সায়া, রুক ইত্যাদি), তাঁতে-বোনা নানা রকমের শাড়ি, মাটির তৈরি জিনিস সুন্দরভাবে সাজানো। দুই পাশে সারিবদ্ধ মহিলা সমিতির সভ্যারা।]

গোপা। (উঠিয়া) আজিকার এই প্রদর্শনী সভায় যোগেশবাবুর সভাপতি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় নীরোদবাবুকে সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম এবং তিনি সানন্দে আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে এখানে এসেছেন। সমিতির সকলে তাঁকে এই সমিতির একজন পৃষ্ঠ-পোষক হিসাবে পেয়ে আনন্দিত। আজ এই সমিতির সভ্যাদের তরফ থেকে তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(জনৈকা সভ্যা কর্তৃক সভাপতিকে মাল্যদান)
(সভ্যারা হাততালি দিল)

নীরোদ। মাননীয়া শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া এই সভায় সভাপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং আপনারা সকলে তা সমর্থন করেছেন। সত্যিই এর জন্য আজ আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। একটা কথা আজ আর না বলে থাকতে পারছি না। শুধু তাই নয়, বলা আমার কর্তব্য। আমি সমিতির শুরু থেকে বরাবর বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে, সমিতি ভেঙে দেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। শুধু তাই নয়, আমারই গাঁয়ের মেয়েদের সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করেছি যা তাদের সম্বন্ধে এমন ধারণা পোষণ করেছিলাম, যা মনে করলে লজ্জায় ও অনুশোচনায় মাথা নিচু হয়ে যায়। তাই আজ সমিতির প্রতিটি সভ্যার এবং উপস্থিত ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়ার কাছে আমি আমার অন্যায় আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছি। আজ গ্রামের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে প্রতিটি পল্লীগ্রামে মহিলা সমিতির আবশ্যকতা আছে। এখন শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া সমিতির গোড়ার কথা কিছু বলবেন।

(বসিয়া পড়িলেন)

গোপা। (দাঁড়াইয়া) আজকের এই সভায় আমাদের মহিলা সমিতি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ১৯৫৩ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এর জন্ম। এর জন্মের এক ইতিহাস আছে। এই গ্রাম শহর থেকে দূরে এক নিভৃত পল্লী। শহরের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ ছিল না বললেও চলে, মহিলা সমিতি তো দূরের কথা—কোন পুরুষ সমিতির চিহ্নমাত্র ছিল না এখানে, বা কোন কালে যে হবে সে রকম কোন লক্ষণও ছিল না। তারপর এল শুভ ১৯৫২-৫৩ সাল, এই অঞ্চল সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনা এলাকা ব'লে সরকার থেকে ঘোষিত হ'ল, কিন্তু এখনও কেউ বুঝতে পারে নি যে, সমাজ কি, এবং তার উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় এবং কেমন ক'রেই বা তা করা যেতে পারে। ক্রমে ক্রমে উন্নয়নমূলক কাজ আরম্ভ হ'ল, যেমন—ডাক্তারখানা, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, রাস্তা, চাষীদের ও শিল্পীদের উন্নতির জন্য বহু রকম ব্যবস্থা। পল্লী-অঞ্চলের উন্নতি করতে গেলে এ সমস্ত দরকার, কারণ সমাজে বাস করতে গেলেই এই সমস্ত অসুবিধা আগে ভোগ করতে হয়।

এখন পল্লীগ্রামের সমাজ বলতে যাদের বোঝায় তাদের অধিকাংশেই হচ্ছে নিরক্ষর চাষী-মজুর, কুম্ভকার, কর্মকার, তন্তুবায়, সূত্রধর ইত্যাদি। এদের উন্নতি করা ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা হ'ল সমাজ-উন্নয়ন কাজের উদ্দেশ্য। তাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আনা দরকার। তার জন্য গ্রামের কাজে তাদের নিজেদেরই এগিয়ে আসা দরকার। কাজের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রত্যয় তাদের হবে। কাজ করার ক্ষমতা হবে। তখন উন্নতি আনাও সহজ হবে। বাইরে থেকে কেউ এসে কিছু ক'রে দিলে তা টিকে থাকাও শক্ত। গ্রামের লোক যতক্ষণ না নিজেরা তার দায়িত্ব নিতে পারবেন, ততক্ষণ এভাবে কিছু করারও অর্থ হবে না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—টাকা দিয়ে নলকূপ বসানো যায়, কিন্তু সে নলকূপ থাকে না বা তার জল পাওয়া যায় না যদি যত্ন নেবার দায়িত্বজ্ঞান লোকের না থাকে। দু'দিনেই ছেলের দল তার হাতল ভেঙে তার মধ্যে পাথর চুকিয়ে তাকে অকেজো ক'রে দেবে। কাজেই সমাজ-শিক্ষার বিশেষ দরকার। এ শিক্ষা শুধু ছেলেদের নয়, মেয়েদেরও দেওয়া দরকার। মহিলা সমিতির কথা যখন প্রথম তুলি ছেলেমেয়ে সকলের কাছেই ঠাট্টা শুনতে হয়েছিল। বহু বিদ্রূপ সহ্য ক'রে গুটিকয়েক মেয়ে নিয়ে এই সমিতি প্রথম শুরু করি।

আর আজ গ্রামের অনেক মেয়েই এর সভ্য। মেয়েদের শুধু গান আর লেখাপড়াই শেখানো হয় না এখানে। তারা যাতে সংসারের কিছু সাশ্রয় করতে পারে, তার জন্য সূতোর কাজ, উলের কাজ, তাঁত-বোনা এবং মাদুর-বোনাও শেখানো হয়। আশা করি, আমাদের এই সমিতির উন্নতির জন্য আপনাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাব।

(বসিয়া পড়িল)

নীরোদ। মাননীয়া শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া সমিতির জন্মের ইতিহাস বলেছেন, এ সম্বন্ধে আমার আর-কিছু বলার নেই। মহিলা সমিতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই মহিলা সমিতির এবং স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা আছে। যদি কেহ মনে করেন যে, পাড়াগাঁয়ে স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা নেই, তা হ'লে আমি বলব তিনি ভুল বুঝেছেন। অনেককে বলতে শুনেছি আমাদের মেয়েরা তো আর চাকরি করবে না। কাজেই তাদের লেখাপড়া শিখা দিয়ে কি হবে? এইখানেই তাঁদের বোঝার ভুল। লেখা-পড়া শেখা যে শুধু চাকরি করার জন্যই নয় সে ধারণা মন থেকে দূর করার দিন এসেছে। অনেকে বলেছেন বউদের এ বয়সে শিখবার কি আছে, তাদের লেখাপড়া শেখার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমি বলি তাদের লেখাপড়া শেখারও আবশ্যকতা আছে। কারণ তাদের হাতেই দেশের ভাবী ছেলেমেয়েরা প্রথম মানুষ হচ্ছে। মা-র প্রভাব ছেলেমেয়ের ওপর সবচেয়ে বেশি। কাজেই তাকে অজ্ঞ রাখলে চলবে না। যেটুকু জ্ঞানের সুযোগ আমাদের কাছে আসে তার সদ্ব্যবহার যেন আমরা করতে পারি। আজ তাই ছেলেমেয়ে সকলেকই এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রদর্শনীর জন্য এই সমিতির সভ্যারা যে পরিশ্রম করেছে তাদের সকলকে অভিনন্দিত করছি। আমি আশা করছি সমিতির মধ্যে দিয়ে অন্দর মহলে আলো ঢুকবে অন্দরের কালিমা দূর হবে।

(সমাপ্ত)

বাজারহাট ব্লক—শিশু-দিবসে মহিষমোট গ্রামে শ্রী কে দি ঘোষাল, বাজারহাট মহকুমা-শাসক, শ্রী এম এন রায়, সমবায়ী প্রধান সমাজ-শিক্ষা পরিদর্শক, শিশু-দিবসে ভাষণ দিচ্ছেন

পুড়শুড়ায় একদিন

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার লাহিড়ী

সমবায় পরিদর্শক, পুড়শুড়া সি ডি ব্লক

উন্নয়ন কমিশনার পুড়শুড়ায় এসেছিলেন একদিনের জন্য। প্রথমে কথা ছিল তিনি ২৮এ ফেব্রুয়ারি পুড়শুড়ায় আসবেন কয়েকটি ট্রেনিং সেন্টার উদ্বোধন করতে এবং তার সাথে একটি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংস-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। খবর এল ২৬এ ফেব্রুয়ারি, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে ২৮এ না এসে তিনি আসবেন ২৭এ ফেব্রুয়ারি।

উন্নয়ন কমিশনার মহোদয়ের বেলা ১১টার মধ্যে চাঁপাডাঙ্গায় আসার কথা। ঘড়ির কাঁটা যখন ১১টা থেকে ১২টায় পৌঁছাল তখন সকলের মনে নানারকম আশঙ্কা উঁকি দিতে লাগল। সকলে ঘর-বার শুরু করে দিলেন। কোন কারণে যদি তাঁর আসা বাতিল হয়ে গিয়ে থাকে তো এইসব উৎসুক জনসাধারণকে কি বোঝানো যায়। বি ডি ও শঙ্করবাবু ভয়ানক ভাবনায় পড়ে গেলেন। ১২টার কিছু পরেই সকল আশঙ্কা অমূলক প্রমাণ করে কমিশনার মহোদয়ের গাড়ি দেখা দিল। ঘমঘমে ভাব কেটে গিয়ে সকলের মুখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল। প্রথমেই নামলেন ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ শ্রীমুকুল গুপ্ত, তারপর শ্রীরবি সেন এবং সবশেষে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, "পথে কোন.....।" হাসিমুখে সকলকে নিরস্ত করলেন তাঁরা। মুখ্য-মন্ত্রিমহোদয়ের জরুরী আহ্বানে এই অনিচ্ছাকৃত দেরি।

প্রথমেই আমরা রওনা হলাম মাইল দেড়েক দূরে শ্রীরামপুরের দিকে। এই শ্রীরামপুরে প্রায় বছর তিরিশেক আগে সাধুখাঁ পরিবারের বদান্যতায় গড়ে ওঠে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দেশের নব পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করে এটিকে তাঁরা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিণত করছেন। বড় মনোরম পরিবেশে বিদ্যালয়টি অবস্থিত হবে। একদিকে দামোদরের জলধারা, সুমুখে বড় বড় ছায়া-ঘেরা গাছ, আর দূরের শস্য-শ্যামল ক্ষেত শিশু-মনকে শ্যামল করে তোলারই উপযুক্ত জায়গা। উদ্বোধনী সঙ্গীত, সংস্কৃত স্বস্তিবচন, মঙ্গলাচরণ ও গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে মানপত্র প্রদানের পর, বিভিন্ন বক্তা মুখে শ্রীরামপুর নয় সমস্ত পুড়শুড়া থানার সমস্যা-গুলির এবং শ্রীরামপুর অতুল্য-মূল্যে নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের কথা সংক্ষেপে বললেন। এর পর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন পর্ব শেষ হ'ল। কমিশনার মহোদয় একদিন আগে আসার জন্য ও এক ঘণ্টা দেরি হওয়ায় অনুতাপ প্রকাশ করে তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। দামোদরের বুকে-করা বালি, বড় বড় গাছের শান্ত ছায়া, সুন্দর ও সুমার্জিত প্রাঙ্গণ তাঁর কবি-মনকে যে মুগ্ধ করেছিল তা তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ পেল। শিক্ষার কথা ছাড়াও তিনি পুড়শুড়ার প্রধানতম প্রয়োজন জলের কথাও আলোচনা করলেন। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নাচ-গান হওয়ার পরেই তাদের মিষ্টি বিতরণ করা হ'ল। মনে হয় এই অনুষ্ঠানটি সকলকে আনন্দ দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। একটি ছোট প্রদর্শনীর উদ্বোধন এবং চা-পানান্তে শ্রীরাম-পুরের অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। এই অনুষ্ঠানটি সফল করার মূলে ছিল রাসবিহারীবাবু ও প্রতিটি গ্রামবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও আন্তরিক প্রচেষ্টা।

এবার মাইল তিনেক দূরে ফতেপুরে যাওয়ার পালা। ফতেপুরে তন্তুবায় শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্র ও তন্তুরঞ্জন শিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্র একই বাড়িতে অবস্থিত। আশুতোষ সেবাকেন্দ্র নামে একটি হাসপাতাল হওয়ার কথা এখানে। অনাথ সমাজ-কর্মী শ্রীবেণীমাধব রায়ের সহযোগিতায় এই বাড়িটি কিছুদিনের জন্য পাওয়া গিয়েছে। ফতেপুরে পৌঁছে দেখি বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। নতুন চুনকাম-করা বাড়ি, দরজা-জানলার আলকাতরার গন্ধ, দেবদারু-সাজানো তোরণ এবং বহু লোকের ভিড় নির্জন জায়গাটিকে সরগরম করে তুলেছে। একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে শিক্ষণকেন্দ্রের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন কমিশনার মহোদয়। তাঁত, ফ্রেম, জ্যাকার্ড ইত্যাদি দেখতে দেখতে তিনি ছাত্রদের দু'একটি প্রশ্ন করলেন। তারা বেশ চটপট জবাব দিলে। তাদের হাতে-বোনা পর্দা, বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি ভারি চমৎকার হয়েছিল। মুকুলবাবু রঙ করার ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন ছাত্রদের। দেখলাম তারা চোঁক গিলছে। বুঝলাম ব্যাপারটা খুব সুবিধার নয়। স্থানীয় ভদ্রলোকদের সাথে তাঁতশিল্প ও তাঁতশিল্প সমবায় সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনাও চলতে থাকল। পাশেই ফতেপুর স্কুল নতুন বাড়ি তৈরি করছে। সেটির দ্বারোদ্ঘাটন

পর্বও সারতে হল কমিশনার মহোদয়কে। তাঁকে হাতের কাছে পেয়ে সকলের আনন্দ ও উৎসাহের যেন সীমা নেই। শ্যামসুন্দর ইউনিয়নের গ্রামসেবক বিনয়বাবু এবং গ্রামবাসীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ফতেপুরের অনুষ্ঠানটিকে ত্রুটিহীন ও সাফল্যমণ্ডিত করেছিল।

এদিকে বেলা গড়িয়ে যায়। এখনও বহু দূর যেতে হবে। কলকাতায় ফেরাও আছেই। মাইল ছয়েক দূরে জঙ্গলপাড়ায় গিয়ে থামলাম। এখানে ব্লক অফিসের বাড়ি ও কর্মচারীদের আবাস তৈরি হবে। প্রায় ১২ বিঘা জমির ওপর বাড়িগুলি তৈরি হবে। এই জমি সরকারকে কিনতে হয় নি। জঙ্গলপাড়া, পুড়শুড়া ও ডুংরেড়ার ১৫ জন গ্রামবাসী এই জমিগুলি স্বেচ্ছায় ও নিঃশর্তে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে দান করেছেন। সমষ্টি-উন্নয়ন কার্যক্রম যে পুড়শুড়ার গ্রামাঞ্চলে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে জঙ্গলপাড়ার এই জমি সংগ্রহ ও ব্লক অফিসের বাড়ি তৈরিই হচ্ছে তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত। প্রত্যেকে যে যার সামান্য ছোট ছোট প্লটের জমি দিয়ে এভাবে এতটা জায়গা সরকারকে দান করার দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও যে দেখা যায় নি সেকথা কমিশনার মহোদয় তাঁর বক্তৃতায় বারবার বললেন।

এখন জায়গাটি সম্বন্ধে দু-এক কথা বলছি। পুড়শুড়া থানার প্রায় মাঝামাঝি এই জমিগুলি অবস্থিত। পাশেই আরামবাগ-তারকেশ্বর পিচ-রাস্তা। একটু দূরে রাস্তার ওপারে থানা ফার্ম, আর-একপাশে একটি বড় পুকুর, চারিদিকে শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার। এই জমিগুলি দো-ফসলী এবং বিঘা-প্রতি এক হাজার টাকা দরে হেসেখেলে বিকোয়। জায়গাটি সকলের পছন্দ হল। শ্যামল প্রান্তরের মাঝে শামিয়ানা টাঙিয়ে সভা করেছেন গ্রামবাসীরা। অল্প দূরেই দামোদরের দীর্ঘ জলধারা।

সন্তোষ সামন্ত, মাণিক গুহাইত, কালী বেরা, কিশোরী হাজরা প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা এসে অভ্যর্থনা করলেন সকলকে। কমিশনার মহোদয় তাঁর বক্তৃতায় বললেন যে, জঙ্গলপাড়া, পুড়শুড়া ও ডুংরেড়া গ্রামের দাতাদের এই মহান দান শুধু যে তাঁদের হৃদয়ের প্রসারতা জ্ঞাপন করেছে তা নয়, এতে প্রকাশ পেয়েছে ব্লকের প্রতি এখানকার জনগণের আন্তরিক প্রীতি-স্পর্শ এবং এতে করেই পুড়শুড়া ব্লক লাভ করেছে তার সার্থকতা ও চরম আশীর্বাদ। দাতাগণের পক্ষ থেকে মাণিকবাবু তাঁদের দানপত্রটি পড়ে শোনালেন এবং কমিশনার মহোদয়ের হাতে অর্পণ করলেন। কমিশনার মহোদয় কর্তৃক ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের সময় শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় মঙ্গলাচরণ ও একটি ছোট্ট বক্তৃতা করলেন। ভূদান-যজ্ঞ ও অন্যান্য মহান কার্যের কথা স্মরণ করে তিনি শ্রদ্ধা জানালেন দাতাদের প্রতি। গ্রাম-বাসীদের উদারতা না থাকলে এ জমি পাওয়া যেত না একথা সত্য, কিন্তু আর-একজনের কথা না বললে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইনি হচ্ছেন পুড়শুড়া ও ডিহিবাতসুর ইউনিয়নের গ্রামসেবক শ্রীহরিপদ হালদার। প্রকৃতপক্ষে হরি-বাবুর আন্তরিক প্রচেষ্টা, অসীম পরিশ্রম ও জন-হিতকর কাজগুলিই তাঁর ইউনিয়নের সহৃদয় ও উচ্চমনা গ্রামবাসীদের সোনার চেয়েও দামী এই জমিগুলি সরকারকে দান করতে সাহায্য করেছে।

জঙ্গলপাড়ার সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা চললাম পুড়শুড়ায় কাষ্ঠশিল্প শিক্ষণকেন্দ্র দেখতে। এ কেন্দ্রটিতেও কাজ শুরু হয়ে গেছে। ছাত্ররা তাদের তৈরি দরজা-জানলার ফ্রেম, চেয়ার ইত্যাদি দেখালেন। কমিশনার মহোদয়, মুকুলবাবু ও অন্য সকলে খুব খুশি হলেন ছাত্রদের শেখবার আগ্রহ দেখে।

ট্রেনিং সেন্টারের সব কাজ শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি চারটে বেজে গেছে। এবার আরাম-বাগ যাওয়ার পালা এবং তারপর কলকাতায় ফেরা। অতএব গাড়িতে উঠে পড়া গেল। মুণ্ডেশ্বরী নদীর হরিণখোলা ঘাটে গিয়ে দেখি আরামবাগের বি ডি ও অপেক্ষা করছেন। কমিশনার ও অন্যান্য সকলের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম।

মঙ্গলাকোটের চিঠি

(তৃতীয় পর্ব)

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র দে

হাঁ তোমার কথা ঠিকই। তবে বুড়ী ঠাকুমার তোবড়ানো গাল দুটো এখন দেখে তার যৌবনকালের মুখের চলসটা ঠিক তেমন ছিল, ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা বলতে পারে কি? তারপর কোন বুড়ী যদি গল্প করে যে, বয়সকালে একরাশ গয়না পরে সে গা দুলিয়ে দুলিয়ে এমনি করে চলত, তখন সবাই হেসেই খুন হবে যে। মঙ্গলাকোটের অবস্থাও আজ কতকটা তাই। অতএব, তার হীরা-মুক্তা-মাণিকের হিসাবটা ফর্দ করে মিলিয়ে দিতে যাওয়া তেমনি হাসাকর ব্যাপার ছাড়া কিছু হবে না। অবশ্য ভগ্ন প্রাসাদের কোণে কিল্লী যে ডাকে না তা নয়, কিন্তু সুর-সুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ কিনা হলফ করে বলতে যাওয়া আরও ধৃষ্টতা মাত্র।

দেখ, বড়লোকের খাতির সবাই করে, ইতিহাসই বা করবে না কেন! সেদিন দিল্লী দক্ষিণ ভারত নিয়ে সবাই ব্যস্ত ছিল। মঙ্গলাকোটের দিকে তাকিয়ে দেখবার সময় ছিল কি কারোও? তা ছাড়া, ঘরে ক'জন তাকিয়ে দেখে, বল: বাইরের জাঁকজমকেই তো সবাই ভুলে থাকে।

অন্যে ভুলতে পারে, কিন্তু দেশের মাটি তো দেশের সন্তানকে ভুলতে পারে না। তাই ইতিহাসের

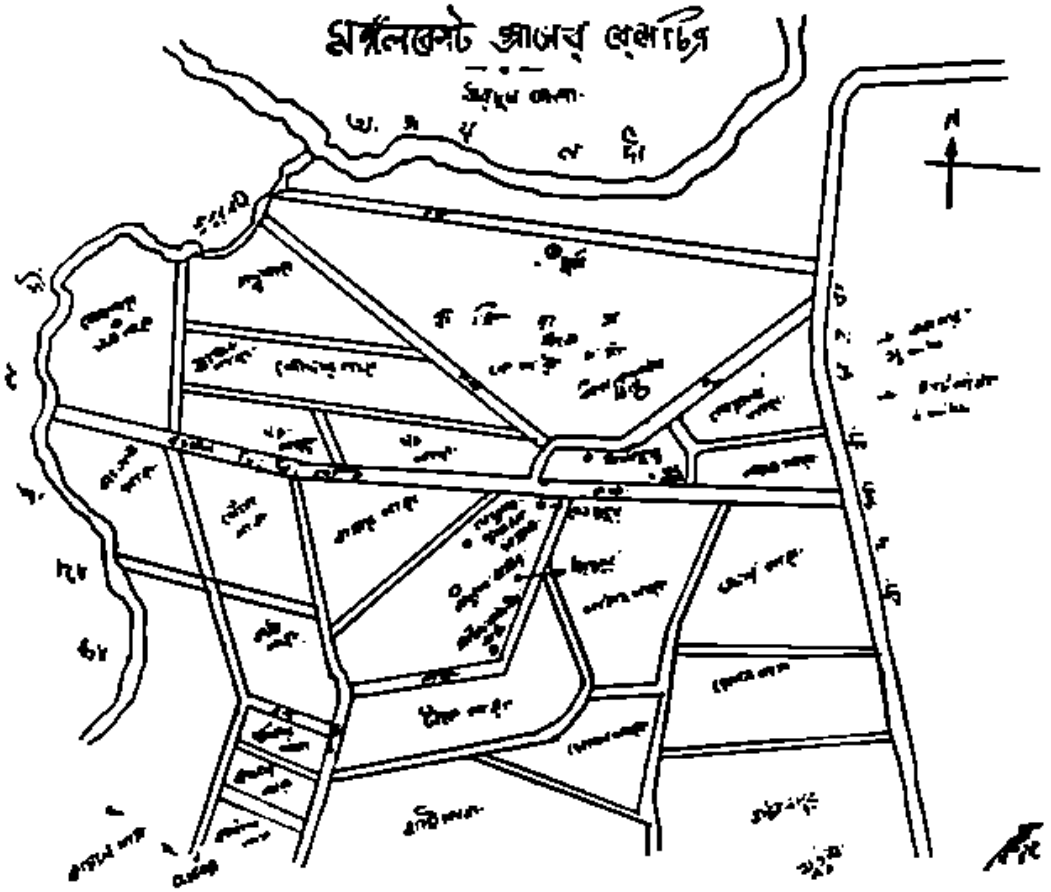

পাতায় মঙ্গলকোটের ছবি রইল না বটে কিন্তু বর্ধমানভুক্তি বুক থেকে তার শেষ স্মৃতি মুছে ফেলতেও চাইল না। মৃতবৎসা মা-র কাছে যেমন ছেলের খেলনাগুলিও প্রিয়, সেগুলিই সে কুড়িয়ে

রাখে, অন্যের কাছে যতই তুচ্ছ হোক না। মঙ্গল-কোটের তুচ্ছ জিনিসগুলো আজও তাই সব হারায় নি।

রাজপথগুলো বড় বড় সড়কও যে ছিল না, তা নয়। যুগযুগান্তের পথিকদলের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে-যাওয়া বুক নিয়ে পড়ে আছে, দেখবে এখানে-সেখানে।

মজা হয়েছে কি জান! এমনি ক্ষয়ে যেতে যেতে কতকটা অংশ কেটে একদম মাটিতে বসে গিয়েছে, একেবারে পাঁজরে বসে যাওয়ার মত। ইতিহাস পরিহাসের অতীত হয়ে টিকে রয়েছে তো। তাই মঙ্গলকোটের গ্রাম-পরিকল্পনার খানিকটা আজও দেখতে পাওয়া যায়। তারই একটা রেখ-চিত্র তুলে দিলাম। বিচার করে আমাকে বলবে, এই বিংশ শতাব্দীতে তো আমরা এ রকম গ্রাম গড়বার স্বপ্ন দেখি কিনা।

বিস্মৃত যুগের মঙ্গলকোট! কিন্তু বসতিবিন্যাসে প্রত্যেকটি পাড়া কেমন প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে ঘের, বাড়ি থেকে পা বাড়ালেই পথ। এই পথই আমাদের বর্তমান পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সমস্যা। আর সে সুবোধটি তারা এনে দিয়েছিল প্রত্যেক গ্রামবাসীর দোরে, নয় কি?

সেইসঙ্গে করেছিল জলনিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। কুন্দুর এখন যাকে আমরা নদী বলি—খোদিত হয়েছিল এর জন্য। তার সাথে যুক্ত হয়েছিল গ্রাম থেকে বেরিয়ে-যাওয়া ছোট ছোট পয়ঃপ্রণালী।

স্থলপথ ছিল পূর্বদিকে বাদশাহী সড়কে, জলপথ পশ্চিমদিকে কুন্দুরে, মিশেছে গিয়ে উত্তরে অজয়ের বিশাল স্রোতধারার সঙ্গে। মাঝখানে গ্রামখানি বিন্যস্ত হয়ে রাজপথ ধরে যোগাযোগ রক্ষা করেছিল বাইরের পৃথিবীর সাথে।

গ্রামের মধ্যস্থলে সেদিনের নাগরিকগণ বসিয়েছিল বাজার। শিক্ষাকেন্দ্র তৈরি হয়েছিল এমনস্থানে যেখানে প্রত্যেক বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা সহজে এবং স্বচ্ছন্দে যেতে পারত। বাজার পাড়া নামটি তো নকশায় দেখতেই পাবে, মাদ্রাসাও চিহ্নিত রয়েছে। ওখানেই টোল থেকে ওর জন্মান্তর ঘটেছে। সবাই বলে, কতকাল কে জানে।

কারিগর, কর্মকার, স্বর্ণকারপাড়া একদিকে অর্থাৎ শিল্পকেন্দ্র গ্রামের একস্থানে। ব্রাহ্মণপাড়া, ভাদু-পাড়া, দত্তপাড়া, পোদ্দারপাড়া, অন্যদিকে। আর বকসীনগর—বকসী মানে কর্মচারী শ্রেণীর নগর, অপর একদিকে। গ্রামের মধ্যে সমব্যবসায়ীদের একসঙ্গে বাস করবার সুব্যবস্থা হয়েছিল সেদিন। নয়াদিল্লীতে নাকি এই ব্যবস্থার চেষ্টা চলছে আজ-কাল, তোমাদের কলকাতায় হয় নি এখনও। মঙ্গল-কোট কিন্তু সেদিন এটা করতে পেরেছিল। তা হলে কি আমরা বলতে পারি, যে উচ্চ পৌরবোধের বিকাশ এখানে দেখি তা সামান্য নয় এবং সেদিনের মঙ্গল-কোটের বাকি পরিচয়টুকু এ থেকে অনায়াসে অনুমান করা যেতে পারে। আর সব মণি-মুক্তা হারিয়ে গেছে বলে এসব মণিমুক্তার তুমি কোন দাম দেবে না?

বড় রাজারাজড়া দেশে না থাকলে দেশের বড় হয় না, না? এই যদি তোমার ধারণা হয়, তা-ও দেখতে পারি। গ্রামের মধ্যে রাজবাড়ি, অদূরে নদীর দিকে পাহারা দিচ্ছে সৈন্যগণ, সেইজন্য সেখানে বসেছে সেনাপাড়া, বাদশাহী সড়কের ধারে রয়েছে সর্দার-পাড়া ইত্যাদি, অর্থাৎ এদিকটাও করা হয়েছে সুরক্ষিত। এমন কঠোর রক্ষাব্যবস্থা চুনোপুঁটি রাজার জন্য কি দরকার হয়? খানিকটা দূরে রয়েছে জহরকুন্ড। এখানে কি রাজার জহরভাণ্ডার ছিল? তার পাশে মাহারতুবা গ্রাম। মোহরের স্তূপ থেকে মহরতুপা, তা থেকে মাহারতুবা নামটি হওয়া বিচিত্র নয়। এত মোহর মঙ্গলকোটের রাজার ছিল কল্পনা করতে বেশ লাগে। কিন্তু এত মোহর যদি থাকবে সেসব গেল কোথায়, একটা প্রশ্ন করতে পার আমাকে। কালে কস্মিনে নদী থেকে জেলেদের জালে এক আধখানা ওঠে। সেদিনও একজন পেয়েছে একখানা, স্বচক্ষে দেখেছি। তাই বলে কি ভাবা যায়, কোথাও মোহরের স্তূপ থাকতে পারে?

কিন্তু খানিকটা দূরে ভাটদের থাকতে দোষ কি? এখন ভাটপাড়া একটি মুসলমানপ্রধান গ্রাম। রাজ-বাড়ির কাছেই তো ভাটরা থাকত, কিন্তু ওরা গেল কোথায়? ধরে নেয়া যাক মরে হেজে গিয়েছে। মানুষ মরবে সে একটা বড় কথা নয়।

কিন্তু জাঁদরেল রাজা হলে তার তো আরও অনেক-কিছু থাকা চাই। দেবালয় প্রতিষ্ঠা করল না, গড়-দুর্গ রইল না—এ আবার কেমন রাজা, বলতে পার তুমি। ছিল। দেবালয় ছিল বলেই একটা গ্রামের নাম দেউলিয়া হয়েছে। আর নূতন-হাটের কাছে অজয় ও কুন্দুরের সঙ্গমস্থলে উঁচু ঢিবির উপর যে ভাঙ্গা বাড়িটা রয়েছে তার গঠন ও অবস্থিতি দেখে যে-কোন আনাড়ী লোকও বলতে পারবে, আর যে-কোন উদ্দেশ্যেই এটি তৈরি হয়ে থাক মঙ্গলকোটকে পাহারা দেবার বিকল্প দায়িত্ব এর ছিল। আর ছিল বেউর বাঁশে ঘেরা গড়, বড়াসড়ে খানিকটা আজও দেখতে পাবে, হেজেমজে রয়েছে।

এত কথাই বা বলছি কেন? ইতিহাস বিস্তারিত খবরের দাবি রাখলেই বা! তাই বলে ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকার অন্নপ্রাশনের ভাত থেকে আরম্ভ করলে অতি বড় ঐতিহাসিকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে যে তাতে।

সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে আমি পঞ্চাশপ্রসরণ করছি, ভাবছ তুমি? বাঙলায় তখন এর চেয়ে বড় রাজা ছিল, সুতরাং মঙ্গলকোটের রাজাকে 'সামন্ত রাজা' বলতে পার তুমি। চাই কি 'লোয়ার-রাজা' বললেই বা কি করব আমি? এখানে একটা কথা শুধু জিগ্যেস করব তোমাকে। ভারতবর্ষে এই যে ছোট ছোট রাজাকে নিয়ে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তা কি তার দুর্বলতার লক্ষণ, না, এ-ও একটা রাষ্ট্রগঠনা রীতি ছিল। যুধিষ্ঠির রাজচক্রবর্তী হয়ে অধীন রাজাদের মাথা কেটে নিয়েছিলেন, না তাদের বাঁচিয়ে রেখেই মানসিক ঐক্যের চেষ্টা করেছিলেন? তা হলে মঙ্গলকোট 'সামন্ত রাজা' থাকলে কি অপরাধ? বরং মনে করি না কেন এইসব ছোট ছোট রাজাকে কেন্দ্র করে একদিন পল্লী-বাঙলায় গ্রামীণ সভ্যতাসৃষ্টির প্রয়াস হয়েছিল এবং মঙ্গলকোটও একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখনকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এলাকা ভাগ করে কাজ করার সুবিধা স্বীকৃত হয়েছে। এখনকার দিনেও তারা এর অর্থনীতিগত ও অন্যান্য উপকারিতা বুঝতে পেরেছিল, তাই দেশটাকে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ করে নিয়েছিল সহজের লক্ষ্যের খাতিরে, ভাবতে দোষ কি?

ভাবলেই তো হবে না। প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ তখনকার দিনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমৃদ্ধিতে। সে-দিনের দেশ এই শাসনপদ্ধতিতে যদি সবল ও সংস্কৃতিসম্পন্ন হয়ে থাকে, তা হলে তাকে আর 'দুয়ো' 'দুয়ো' করা কেন? ভাল জিনিসের ভাল নাম দেওয়াই তো ভাল।

সবল ও সংস্কৃতিসম্পন্ন? তুমি হয়তো অনুচ্চার্য হচ্ছ। তা যদি হত, সেকথা তো মহাকালের শিলালিপিতে চিরকালের জন্য লেখা থাকত। মহাকালের খবর রাখি না ভাই। কিন্তু অনেকগুলো পাথরের উপর লেখা মঙ্গলকোটের এখানে-ওখানে আজও ছড়িয়ে আছে। পাঠোদ্ধার করতে পারলে এখানকার সংস্কৃতি সম্বন্ধে আরও কিছু জানা যেত, ঠিক সেকথা। কিন্তু আমি প্রাচীন দিনের সে লিপি পড়তে জানি না। যাঁরা জানেন তাঁদের এর চেয়ে গুরুত্বের কাজ আছে। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, চিরকাল এ রকম থাকবে না। একদিন এদের পাঠোদ্ধার হবে। এখানে দুটো লিপি আমি তুলে দিচ্ছি। তুমি চেষ্টা করে দেখো, কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিতে পার নাকি। সবাই মিলে চেষ্টা না করলে অনেক অসামান্য তথ্য সামান্যের ভিড়ে থেকে যাবে যে, আর শহরের পাকাঘরে বসে রোমন্থন করে আমাদের দিন কেটে যাবে, কাঁচা ঘাস একটিও জুটবে না কপালে। (শিলালিপি—(১)(২))

তোমার হয়তো সন্দেহ হচ্ছে, মঙ্গলকোটের মত জায়গায় এই প্রস্তরলিপিগুলো থেকে কি আশা করা যেতে পারে? আমার 'সবল ও সংস্কৃতিসম্পন্ন' কথাটাকে অতিরঞ্জিত মনে করছ তুমি! মনে মনে হাসছ, মঙ্গলকোটের আবার কথা, তা বিনা পাথরে লিখে রেখেছে।

এখানে একটা 'বচন' চলতি আছে।

'ছয় কুণ্ড নয় সর
তার হল মঙ্গলকোটে ঘর।'

কতকটা হেঁয়ালির মত দুর্বোধ্য ভাষা। কিন্তু 'কুণ্ড' ও 'সর' শব্দ দুটি এখনও বাঙলা ভাষায় অপ্রচলিত হয় নি। অস্পষ্ট অতীতে আরও অস্পষ্ট

শিলালিপি

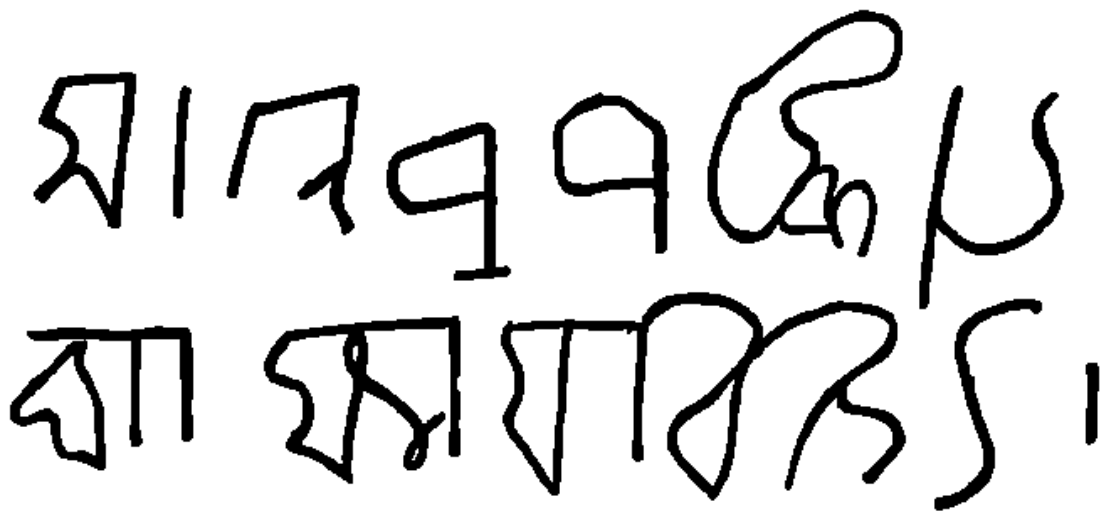

ধর্মাচারে এই শব্দগুলির মাহাত্ম্য ছিল বলেই দৈনন্দিন ব্যবহারে এরা আমাদের কাছে কিছুটা সমীহ পায়। কুণ্ড দুয়টি এবং সর নয়টি এখানে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, তার কোন তাৎপর্য নেই কি? এই তাৎপর্য মঙ্গলকোটের তাৎপর্য। আজ আমরা সবটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। তাই বলে এই দুয় কুণ্ড নয় সরের দেশ তার যে পরিচয়টা তুলে ধরেছিল বাইরের জগতের কাছে তা নিশ্চয় ক্ষীণ কণ্ঠে নয়। তা হলে এতদিন পরে এখানে এসে আমরা তা শুনতে পেতাম না।

যদি বল 'হিং টিং ছট্' এর একটা অর্থও তো হবচন্দ্র রাজার কাছে ছিল, আমার মাথা চুলকানো ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু তোমাকেও একটা প্রশ্ন করতে আমি ছাড়ব না। মধ্যযুগে যে 'মঙ্গল-সাহিত্য' সৃষ্টি হয়েছিল তার নায়ক-নায়িকাগণ কোন্ দেশের লোক? সংস্কৃত সাহিত্যের পরে আমাদের গর্ব করবার মত এমন সমৃদ্ধ সাহিত্য দ্বিতীয়টি হয় নি, এটা তো ঠিক। সে অবদান যুগিয়েছিল কোন্ দেশ?

তুমি বলবে ওটা নিয়ে মতভেদ আছে। ধর্মমঙ্গলে যেটুকু আছে তাতে কিন্তু কোন গোলমাল নেই। "ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি ঘনরাম লাউসেনকে উজানীকো গ্রামের পাশে মঙ্গলকোটে হরি তাম্বুলীর গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন।" ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক।

"তাঁহার পরবর্তী জীবনে সঞ্চিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহার স্বভাব কবিত্বের উপর পাণ্ডিত্যের প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছে।" লিখেছেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে'।

তিনি হেঁজিপেঁজি লোক নন নিশ্চয়। আবার দুই শতাব্দীর আগের লোক ঘনরাম। অতএব, তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় বলে উড়িয়ে দেওয়াও সহজ নয়।

এ কথাও আবার ধর্মমঙ্গল কাব্যেই লেখা আছে, গৌড় থেকে ঢেকুরে বাড়ি ফেরবার পথে লাউসেন মঙ্গলকোটের রাজা গজপতির কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঢেকুর হল বর্ধমান জেলার অমরাগড় এলাকায়। গৌড় থেকে লাউসেন মঙ্গল-কোট হয়ে সেখানে যান কি করে? এ গৌড় কোথায়? গৌড় নিয়ে ঐতিহাসিকগণ যতই মারা-মারি করুন, আমাদের এ গৌড় হল "গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রে বঙ্গেশ্বরং সুসম্পদং" লোকে বলা হয়েছে যে দেশের কথা, রাজধানী তার যেখানেই হোক না। যেতে হয় বর্ধমান হয়ে যেখানে লাউসেন তার একটি কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। সেই গৌড় থেকে ঢেকুর যেতে পথে পড়ে উজানী-মঙ্গলকোট। কবি কঙ্কের চণ্ডী-মঙ্গলে লেখা আছে—

"গন্ধবান্যা জাতি উজানি স্থিতি
দত্তকুলে উতপতি,
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসি নাম ধনপতি।"

আর কি উজানী অজেয় থাকে? তার পাশেই যখন মঙ্গলকোট, তখন এটি আমাদের মঙ্গলকোট না হয়ে যায় না। ঐ নামে দুখানি গ্রামের পাশা-পাশি অবস্থিতি বাঙলাদেশে আর কোথাও নেই। তাই বলছিল ধর্মমঙ্গলের নায়ক-নায়িকাদের সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই।

'মনসা-মঙ্গল' চণ্ডী-মঙ্গলের চরিত্রগুলি সম্পর্কে আছে কি? 'অর্ধবিটি কোট' করে তোমাকে ঠাণ্ডা করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, নইলে আবার তোমার সঙ্গে বকতে হবে অনেক।

"চম্পক নগর বর্ধমানে। উজানী ধনপতি শ্রীমন্তের বাসস্থান নয় শুধু, লখিন্দরের শ্বশুরবাড়ি। মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রায় সকলেই একথা বলেছেন।"

শ্রীবিনয় ঘোষ লিখেছেন একথা তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে। আর বোধ হয় তোমার কিছু বলবার নাই। তিনি একথাও বলেছেন, উজানীনগর সেদিন মঙ্গলকোটেরই বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

অতএব, মতভেদটা আর থাকে কোথায়? এখন স্বীকার করতেই হবে মঙ্গলকাব্য সম্পদের মণি-মুক্তোগুলোও তোমরা পেয়েছ এই মঙ্গলকোট থেকে। আমি আরো কিছুটা দাবি করব এই প্রসঙ্গে। মঙ্গলকাব্য নামটাও তোমরা পেয়েছ এই মঙ্গলকোটের নামানুসারে।

"মঙ্গলকোটের দেবী বলে চণ্ডীর নাম হয় মঙ্গল-চণ্ডী" লিখেছেন বিনয়বাবু। তা হলে একথা মেনে নিতে লজ্জা কি, যে কাব্যে রয়েছে মঙ্গলকোট অঞ্চলের জীবন-চিত্র তার নাম দেওয়া হয়েছে মঙ্গলকাব্য।

আমার দাবিটা একেবারে অন্যায় কি? ন্যায়-অন্যায়ের কথা এখন না হয় রেখে দাও। কিন্তু যে পটভূমিকায় এই মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছিল

সেই সম্পর্কে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য কি বলেছেন, শোন।

"এদেশে আর্য-সভ্যতা স্থাপিত হইবার পূর্বে সাধারণ জনগণের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে সেইসকল ধর্মবিশ্বাসেরই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।"

এখন একবার ভেবে দেখ সেই 'ছয় কুড়ি' নয় সবের যুগ থেকে কি আরও পূর্ব থেকে এখানকার জন-মানস কি ছিল, কি মহৎ সংস্কৃতির সম্ভার ছিল তার যে বনিয়াদের উপর এত বড় একটা সৃষ্টি সম্ভব হতে পেরেছে।

এখনও তুমি বলবে, আজব দেশ এই মঙ্গলকোট? তার বলবার কথা কিছু থাকে নি, নেয় নি কিছু তোমাদের সভা সমাজকে? দিয়েছিল, তবে অনেক-দিন আগে, নয়? কবে ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছ হাত লুকে কাতকাল চালাবে, বলবে তো?

মধ্যযুগের পরের খবর বুঝি তোমাকে বলা হয় নি। মোগল যুগ থেকেই আরম্ভ করি। ইতিহাসের কন্টিপাথরে বেশ কষে নিতে পারবে, আমিও বেঁচে যাব, প্রমাণের জন্য হাতড়ে বেড়াতে হবে না।

আচ্ছা, আকবর বাদশাহের ছেলের নাম সেলিম রেখেছিলেন কেন? এবার নিশ্চয় তুমি হাসছ! এই তোমার ইতিহাস? লোকে ছেলের নাম রাখবে তার আবার কেন আছে নাকি? রামকান্ত রাধাকান্ত কত নামই তো লোকে রাখে।

জানি। আমি সেকথা বলছি না। ও নামে দিল্লী বা আগ্রাতে একজন বিখ্যাত ফকির ছিল কি তখন যার 'খিদমৎ' করে সম্রাট পুত্রলাভ করেছিলেন আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য গুরুর নামে রেখেছিলেন পুত্রের নাম, আমরা যেমন রাখি গুরুচরণ?

সেলিম চেষ্টীর কথা বলছি আমি।

তোমার দিল্লী বা আগ্রা আর কোথায় মঙ্গলকোট। আর কোন প্রসঙ্গে কোন প্রসঙ্গ টেনে আনছি ব'লে অভিযোগও তুমি করবে। দূর বে, আমি কি জানি না? কিন্তু এসে গেলে আমি কি করব? সংস্কৃতিগত ঐক্যের টুকরাটাকরা এখনও এত পড়ে রয়েছে এখানে, ভৌগোলিক দূরত্ব তার কাছে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে যে! আশ্চর্য হচ্ছ বুঝি। শোন তবে।

(ক্রমশ)

নন্দীপাড়া

শ্রীগণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রামসেবক, ইন্দাস

ক্ষুদ্র গ্রামই দেশের প্রাণ। যে গ্রাম ছিল এতদিন অবহেলিত, যার পরিচয় ছিল অজ্ঞতার অন্ধকারে, —সেইসব গ্রাম আজ ধীরে ধীরে মাথা খাড়া ক'রে উঠছে। তার অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য আজ তার কত না চেষ্টা।.....উন্নতির আগ্রহ মানুষের চিরন্তন!

এমনি একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্গে আজ পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। গ্রামটির নাম 'নন্দীপাড়া'। বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত ইন্দাস ইউনিয়নেরই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামটি এত ছোট যে, অন্য গ্রামের মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন ক'রে দিয়ে নিজেকে "পাড়া" নামের আলোয়ানে জড়িয়ে নিশ্চিন্ত সুখে দিন গুনেছিল। নিজেকে "গ্রাম" বলতে যেন সাহস পায় নি এতদিন। যেন "বড় গাছের তলায় যে জন রয়, তার কি আছে ভয়?" এই ভাব। কিন্তু মনে করতে পারে নি—"কাল বোশেখীর ঝড়ে, ভাঙলে শাখা, সেই তো আগে মরে।"

মাত্র ৪৫টি ঘর, ১০৬ জন লোকের বাস এই গ্রামে। তবে ভরসা এই যে, পৃথিবীতে আসার দিনটি থেকে একেবারে যাওয়ার দিনটি পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যত রকম লোকের দরকার, সকল শ্রেণীর লোকই আছে এই গ্রামটিতে। নিরক্ষরের সংখ্যা যেমন এর মধ্যে বেশি, আবার এরই মধ্যে আছে শিক্ষক, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ। যেমন আছে অর্ধাহারী, অনাহারী—আবার আছে নিজে খেয়ে অপরকে খাওয়াবার মত ক্ষমতাবান, আছে দানবীর।

যেমন আছি, বেশ আছি—এই ভাব নিয়েই কি চিরকাল সবাই থাকে? আজকের দিনে এমন লোক নেই। যদি থাকে তার চোখ এখনো অন্ধ। নন্দীপাড়ার চোখ আজ খুলেছে। সে আজ চায় তার অস্তিত্বকে সবার কাছে প্রকাশ করতে। সে আরও চায় তার পাশের অন্যান্য গ্রামকে তার সাথে টেনে তুলতে।

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রও চায়—পিছে যারা প'ড়ে আছে তাদের সামনে টেনে তুলতে। সকলের ভেতর সুখকে সমভাবে বণ্টন ক'রে দিতে। দেশকে গড়তে হ'লে আগে চাই গ্রামকে। তাই আজ থানায় থানায় উন্নয়ন সংস্থা। তার মাধ্যমে পাওয়া যাবে নানা সুযোগ—পড়ে থাকা গ্রামকে সাহায্য করতে।

আগে চাই গ্রামের ভেতর সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করবার প্রেরণা। থাকতে হবে সমস্ত রকমে দলাদলির ঊর্ধ্বে। নন্দীপাড়ায় তাই আজ গড়ে উঠেছে সঙ্ঘ—সেই সঙ্ঘের কর্মোদ্যম সবাই আজ আশার আলোক দেখাচ্ছে।

এই সঙ্ঘ গোড়ায় ছিল "পাঠাগার", যার পাঠক ছিল ৩-৪ জন আর বই এর সংখ্যাও ছিল তদনুরূপ। আর আজ সেই পাঠাগার শুধু পাঠাগারই নয়, আজ সে সঙ্ঘে আছে পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ, ক্রীড়া বিভাগ, কীর্তন, সঙ্গীত, যাত্রা বিভাগ, হয়েছে নৈশ বিদ্যালয় বিভাগ, আছে দুগ্ধবিতরণ কেন্দ্র, আবার হয়েছে মহিলা বিভাগ। আজ এই সঙ্ঘ শুধু নন্দীপাড়া গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে আরও অনেক গ্রাম পর্যন্ত।

গ্রামেতে আছে একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু ছিল না তার ঘর। কখনও বটতলায় কখনও বা কারও চণ্ডীমণ্ডপে বসতে হ'ত বিদ্যার্থীদের ও বিদ্যাদাতাদের। উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ থাকে না সেখানে কোন বাধা। বিনা দ্বিধায় দান করলেন বিদ্যালয়ের জন্য স্থান। এইবার দরকার অর্থের। তাও যোগাড় হয়ে গেল আর একজন পরহিতব্রতী, শিক্ষাবিদের কাছ থেকে। এঁরা সবাই এই সঙ্ঘেরই বিশিষ্ট সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষক। এবার প্রয়োজন শ্রমদান। নিশ্চয় পরাঙ্মুখ হবে না সঙ্ঘের সভ্যগণ এই মহৎ উদ্দেশ্যে শ্রমদান করতে।

আজ সকলেরই মনে জেগেছে শিক্ষার আগ্রহ। কিন্তু সুযোগ কোথায় তাদের—যারা দু'মুঠো ভাতের জন্য ১২ বছরের ছেলেকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে পরের ঘরের গরু নিয়ে রোদ-বৃষ্টিকে উপেক্ষা ক'রে মাঠে মাঠে ঘোরবার জন্য? বয়স্ক—যারা নিজেদের সময় হারিয়ে ফেলেছে ব'লে আক্ষেপ করছে, এইসব শিশু, যুবক, বয়স্কদের অক্ষর জ্ঞানদানের জন্যই এই নৈশ বিদ্যালয় বিভাগ। দলে দলে আসছে জ্ঞানার্থীরা। কত আগ্রহ, তারা কিছু

শিখবে, তারাও বড় হবে, হবে সত্যিকারের মানুষ। নাই-বা থাকল বসবার ভাল ব্যবস্থা, নাই-বা পাওয়া গেল সকল সুবিধা; তবু অধীর আগ্রহ—ওরা কিছু শিখবে। নবারুণ সংঘের চেষ্টার ত্রুটি নেই এদের একটু সুবিধে দেওয়ার জন্য।

এতগুলোই জোটে না যাদের এক মুঠো ভাত, কেমন ক'রে চিন্তা করবে তারা, তাদের কোলের ছেলেকে যে একটু দুধ দেওয়া দরকার; সেইসব ঘরের আসন্নপ্রসবা জননী, অন্তর্বর্ত্নী বধূদেরই বা কেমন ক'রে ভাববে এদের জন্য একফোঁটা দুধের কথা? চিন্তা করেছিল নবারুণ সংঘ অনেক দিন থেকে। সাঁতারুয়ের দরদ যেখানে তাদের মনের সদিচ্ছাকে পূরণ করবার সুযোগের অভাব হয় না সেখানে। তাই আজ সংঘ খুলেছে দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র, ইন্দাস তাঁতীয় উন্নয়ন সংস্থার সাহায্যে।

সব কিছুর জন্যই কি আমাদের হাত পাততে হবে সরকারের কাছে? সরকারের দেওয়ার মত ক্ষমতা কতটুকু আছে? নিজেদের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে নিজেদেরই।

পৃথিবীর উপর থেকে হাসিখেলার দিনগুলো যাদের ফুরিয়ে এসেছে, তাদেরও জন্য সংঘে রয়েছে ধর্মচর্চার ব্যবস্থা, রয়েছে কীর্তন বিভাগ। আবার যুবকদের জন্য রয়েছে যাত্রা, রয়েছে নানা রকমারি ক্রীড়ামোদের ব্যবস্থা—সুস্থ, সবল, সক্ষম দেহ গঠনের প্রণালী নির্দেশ ও উপযুক্ত ওস্তাবধায়কের পরিচালনা।

এই সবকিছুর মূলে রয়েছে প্রায় নিরক্ষর একটি যুবক, আর তার সঙ্গে আরও কয়েকটি উদার, নিরলস ও পরহিতব্রতী যুবক এবং তাদের প্রেরণা যোগাচ্ছেন অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকগণ। তাই, মাত্র একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, আজ সেখানে এসে যোগ দিয়েছে আশপাশের আরও কত গ্রাম। এমনি ক'রেই হয়। একজন পথ দেখায়, আর আর সব সেই পথে চলে।

গ্রামকে আদর্শ ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে আরও রয়েছে বহু কিছু করবার। তবে শুভ কর্মপথে একবার যখন পা বাড়িয়েছে, আমরা আশা রাখি এমনি ক'রে ধীরে ধীরে সমস্ত গ্রামই গড়ে উঠবে এবং আমাদের বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষ আবার জাগবে। আবার তার ভাস্বর প্রদীপ পথ দেখাবে সকলে দেশকে, সকল জাতিকে। উন্নয়ন সংস্থা রয়েছে প্রতি কার্যে সাহায্য করতে। প্রথম আরম্ভ শুভার ভবতু।

মহিষবাথান

শ্রীশম্ভুনাথ ভৌমিক

গ্রামসেবক ইউনিয়ন ৯ নং রহমতপুর, পানা করিমপুর নদিয়া

আমি মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার ভগবানপুর ব্লকের অন্তর্গত কাজলাসড়ে গ্রামসেবকের পদেই কাজ করতাম। তারপর করিমপুর থানার রহমতপুর ইউনিয়নে মহিষবাথান গ্রামে গ্রামসেবক পদে বদলি হয়ে কাজে যোগ দিলাম। আসার সময় মনে অনেক আশা ও পরিকল্পনা নিয়ে এলাম। কেননা একে নিজের জেলা, এখানে স্বজাতি ও আত্মীয় বান্ধবের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়নমূলক কাজ করবার সুযোগ পাব। কিন্তু এখানে এসে কিছুদিন গ্রামটি ঘুরে বেড়িয়ে ধারণা হল যে গ্রাম একদম ঘুমিয়ে আছে।

গ্রামের লোকসংখ্যা ১,৯০০ জন। এর মধ্যে শতকরা ৮০ জনই উদ্বাস্তু। বিভিন্ন স্থানের লোকজন বিভিন্ন মন নিয়ে এই গ্রামে এসেছেন। তখন পর্যন্ত দলাদলি, ভেদাভেদ ভুলতে পারেন নি। শতকরা ১৬ জনই চাষী। এই অবস্থায় চিন্তা করলাম যে, এখানে জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে ব্যক্তিগত আর্থনীতিক উন্নতির পথ দেখাতে হবে। সে উন্নতির পথ চাষের মাধ্যমে ব্যতীত হবার উপায় নেই। চাষের দিকে আমি নিজে খুবই আগ্রহশীল হওয়া সত্ত্বেও নিরাশ হয়ে গেলাম। কারণ এটা রোপণের জায়গায় বপন করার মতন।

এই গ্রামে আসার পর মনে মনে একটি লোককে আমার কাজের সহযোগী হিসাবে বেছে নিয়েছি, সে লোকটি হচ্ছে মাস্টারদা। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও বর্তমানে সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক। একদিন মাস্টারদাকে আমার কার্যবিবরণী বললাম। মাস্টারদার কাছ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে বেশ আনন্দ হল।

গ্রাম ঘুরে এসে, অবসর সময়ে মাস্টারদার সঙ্গেই উদ্যোগ ও বিভিন্ন প্রকারের উন্নয়নমূলক আলোচনা করতাম। মনে মনে প্রোগ্রাম করেছিলাম, প্রথমত সকল গ্রাম একসঙ্গে না ধরে একটি গ্রামকেই আদর্শ করে তুলতে পারি কিনা। এই সময় ফেব্রুয়ারি '৫৮-এর শেষ সপ্তাহে অফিস থেকে হাইবাসদের জন্য দুটি ঘর তৈরির নির্দেশ পেলাম। এর মধ্যে একটি ঘর মাস্টারদার সহযোগিতায় গ্রামের এক মুচিকে দিলাম। ৭৫০ টাকা সরকারের দেয় এবং ঘরের মালিকের দেয় ২৫০ টাকা। এইটিই ছিল স্কীম। ঘর তৈরির পর মুচিকে বললাম, গৃহপ্রবেশের দিন সের পাঁচেক বাতাসা এনে পাড়ার অন্যান্য মোড়লমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করে হরিলুট দিয়ে গৃহপ্রবেশ কর।

আর একজনকেও পেয়েছিলাম, তিনি হচ্ছেন আমার বাড়ির মালিক। ১লা বৈশাখে আমরা তিনজন নিমন্ত্রিত হলাম। হরিলুটের সময় জানতে পারলাম, গ্রামের একজন কয়েকজন মাহিষ্য জাতিকে মুচিবাড়ির হরিলুট নিলে জাত যাবে বলে বাধা দিচ্ছেন। এই ব্যাপারে বড়ই দুঃখ পেলাম কারণ নতুনমত এসেই, গ্রামের দলাদলির মধ্যে পড়ে যেতে হল। এই বাড়ির হরিলুটের পর মাস্টারদা ও বাড়ির মালিক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের সঙ্গে অন্য এক বর্ণহিন্দুর বাড়িতে হরিলুট আনতে গেলাম। সেখানে আমাদের তিনজনকে হরিলুট দেওয়া হল না। এতে দুঃখিত হলাম না। গ্রাম কি তা তো জানি। এরই পরিবর্তন আস্তে আস্তে করতে হবে। সময় লাগবে তাতে বহুদিন।

সকালবেলা শুনলাম যে, গ্রামের এক দোকানদার ভদ্রলোকের দোকান থেকে পাড়ার কেউ কোন জিনিস কিনছে না। কারণ দোকানী ভদ্রলোক ঐ মুচি বাড়িতে হরিলুট আনতে গিয়েছিলেন। অবস্থা ক্রমশ জটিল হচ্ছে দেখে মাস্টারদাকে সঙ্গে করে শিকারপুরে বি ডি ও সাহেবের কাছে পরামর্শ নিতে গেলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার জন্যই হয়তো অফিসে মহকুমা-শাসক মহাশয়কেও উপস্থিত পেলাম। বি ডি ও সাহেব ও মহকুমা-শাসকের কাছে মাস্টারদা ও আমি সকল ঘটনা বললাম। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। একটি বরখাস্তের ওপর থানার বড়বাবুকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আইনে মামলা করবার নির্দেশ দিলেন। দারোগাবাবু গ্রামে এলেন ব্যাপারটি ভাল করে জানার জন্য। দারোগাবাবু খবর নিয়ে জানলেন অবস্থা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ এবং গ্রামের লোকদের জানিয়ে গেলেন এভাবে চললে শাস্তি তাদের পেতে হবে। ভয়েই বোধ হয়, হরিলুট-গ্রহণকারীর দোকান থেকে আস্তে আস্তে দু-চারজন করে দোকানের জিনিস কিনতে আরম্ভ করেছে জানলাম।

তারপর চাষের দিকে লক্ষ্য দেবার চেষ্টা করলাম। বীজধান শোধনপ্রণালী দেখাবার জন্য কয়েকজন চাষীভাইকে ডাকলাম। খুব বেশিসংখ্যক চাষী-ভাইকে উপস্থিত না পেলেও কিছুসংখ্যক চাষীকে লবণ জলে ধান শোধনপ্রণালী দেখালাম। এখানকার মাঠের অবস্থা সম্বন্ধে ভাল ধারণা না থাকায় খুব বেশিসংখ্যক চাষীকে উন্নত প্রথায় চাষের জন্য চাপ দিলাম না। প্রথমবার মাত্র নিজের বাড়ির মালিক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়কে দিয়ে জাপানী প্রথায় ধান চাষ, পাট চাষ, সবুজসার প্রভৃতির চাষ করালাম। এই সকল উন্নত ধরনের চাষের কাজে মোটামুটি ফলন ভালই হয়েছিল। পাট একর-প্রতি ২৪ মণ, ধান ২৪ মণ।

মাস্টারদা ও পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয়ের সঙ্গে পরিকল্পনায় স্থির হয় গ্রামে একটি ক্লাবঘর করতে হবে। মাস্টারদা নিজেই ঘর তৈরির জন্য ৩ কাঠা জায়গাও রেজেস্টারী করে দিলেন। এর পর তিনজনে স্থির করে গ্রামের লোকজনের একটা সভা ডাকা হল, তাতে ঘর তৈরি নিয়ে আলোচনা হল। এক পয়সা আদায় নেই, গ্রামের অর্থভাণ্ডার শূন্য, তবু কেউ কেউ বললেন পাকা ক্লাবঘর হলেই ভাল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে, গ্রাম থেকে যা উঠবে তা দেখে পরে স্থির করা যাবে। একুশ দিন গ্রামের ৩০০ ঘরের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘর তৈরির জন্য দাম আদায় করা হল। এই সময় আর একজন বিরোধী পক্ষের নতুন কর্মীকে আমাদের এই কাজের মধ্যে টেনে আনতে পারলাম। তিনি বর্তমানে সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ সরকার।

চাঁদা আদায় কেবলমাত্র নগদে নয়। ডিম, সিম, বেগুন, পাট, সরিষা, ধান, গুড়, বিচালি, মুড়ি, প্রভৃতি নিয়ে তা বিক্রি করে ক্লাবের ঘর তৈরির টাকা সংগ্রহ করা হল। ঘর তৈরির কাজ শেষ হল। এইভাবে গ্রামের প্রথম সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র হল। এস ডি ও মহাশয়ের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হল।

প্রথম সমস্যা দূর করার পর সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীহরেন্দ্রনাথ সরকার এবং যুগ্ম সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক মাস্টারদা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল এই তিনজনের পূর্ণ সহযোগিতায় নিম্নলিখিত গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ করতে সক্ষম হয়েছি। বীজধান শোধন প্রণালী, পাট চাষ, উন্নত বীজের এবং সবুজসারের চাষ, উন্নত মেসিন চালনা করার পদ্ধতি, উন্নত মুরগির চাষ, উন্নত জাতের বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার। সার ও গবাদি পশু ঘরিদ করার জন্য ঋণদান, পতিত জমি সংস্কারের জন্য ঋণদান, কৃষি প্রদর্শনক্ষেত্র স্থাপন, উন্নত হাঁস-মুরগির ডিম সরবরাহ এবং বন সৃষ্টির জন্য বনমহোৎসব দিবস পালন, সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি গঠন, সবুজসার তৈরির প্রচলন, কম্পোস্ট সার তৈরি ও ব্যবহার প্রচলন প্রভৃতি।

সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রে আক্ষরিক জ্ঞানদান ও সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন, তরজা, কবি, থিয়েটার, লাঠি খেলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রে দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়, লাইব্রেরিও আছে। গ্রামের মধ্যে একটি ও স্কুলের কাছাকাছি একটি নলকূপ করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং কিছু টাকাও জনসাধারণ দান করেছেন। তা ব্লকে জমা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে বাস স্ট্যান্ডের কাছে মহিলাদের জন্য একটি বিশ্রামাগার হয়েছে। মেলের জন্য একটি বড় নলকূপ শীঘ্রই বসাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। জুনিয়ার হাইস্কুলের জন্য জমি সংগ্রহ, প্রাইমারী স্কুলের জন্য পাকা ঘরের জায়গায় কাঁচা ঘর তৈরি, সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রের পাশে একটি ধর্মগোলা স্থাপন করা, মুচিপাড়ায় একটি নলকূপ বসানো ও বিক্রয় সমিতি একটি স্থাপন করা হয়েছে।

প্রয়োজনের তুলনায় হয়তো কিছুই হয় নি। কিন্তু সামান্য সামান্য কাজ যা হয়েছে তাতেই যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে জনসাধারণের কাছ থেকে। সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রটি বিশেষ ভালভাবেই ব্যবহার হচ্ছে। প্রতি সন্ধ্যায় ছেলেবুড়োর ভীড় দেখে মনে আমি আনন্দ পাই। গ্রামে নতুন উন্নয়ন সমিতি হয়েছে, তারা গ্রামের কাজ সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ নিচ্ছে। এসব দেখে মনে হয় গ্রামের নেতারা ক্রমশ গ্রামের কাজের ভার নিতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার শ্রীসুনীলরঞ্জন রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণের অধীক্ষক শ্রীসুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
সম্পাদিকা—সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমু-৩৯/৬৫-৭৩৯৫৫৮-৪৯৩:

লেখকগণের প্রতি নিবেদন

লেখকগণ অনুগ্রহ করে তাঁদের রচনার নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। সমস্ত রচনাই ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং চারিদিকে ও প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে স্পষ্টাক্ষরে কালি দিয়ে লিখে পাঠাতে হবে।

কোন উৎসব পালন বা ক্যাম্প ইত্যাদির বিবরণী ছাপাতে চাইলে যত শীঘ্র সম্ভব তা না পাঠালে ছাপানো সম্ভব হবে না।

লেখার মধ্যে কোনও উদ্ধৃতি থাকলে কোন্ লেখকের কোন্ বই থেকে তা উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তা জানিয়ে দিতে হবে।

সমস্ত লেখা নিম্নের ঠিকানায় সরাসরি পাঠাবেন।

সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদিকা, "গ্রামসেবকের চিঠি",
ডেভালপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট,
রাজভবন, কলিকাতা

(উপরে) শ্রীরামপুর গ্রামে উন্নয়ন কমিশনার মাননীয় বুনিয়াদি স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন।

(পাশে) জলপাইগুড়ির উন্নয়ন কমিশনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন।